

নিরাপদ সড়ক : চ্যালেঞ্জ, উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পথরেখা

খোন্দকার মাহফুজুল হক

বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের জীবনরক্ষার অধিকার স্বীকৃত। সেই আলোকে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত হচ্ছেন, আর এর প্রভাব পরিবার ও সমাজের উপর দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সড়ক পরিবহন দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দৈনন্দিন জীবনের প্রধান চালিকা শক্তি। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সড়কপথই মানুষের চলাচলের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু এই সড়ক ব্যবস্থা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের দেশের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোদমে কার্যকর হয়নি, ফলে রাস্তায় প্রতিনিয়ত প্রাণহানি, গুরুতর চোট, আঘাত, অঙ্গহানির ঘটনা ঘটছে। প্রতিবছর হাজারো মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় বা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। নিরাপদ সড়ক তাই শুধু পরিবহন খাতের বিষয় নয়; এটি জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নেরও প্রশ্ন।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সড়ক দুর্ঘটনার হারও বেড়েছে। বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি প্রায়ই গণমাধ্যমে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে থাকে। যেখানে বাস, ট্রাক, মোটরসাইকেল এবং পথচারীদের মৃত্যুহার উদ্বেগজনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার বেশি। বাংলাদেশও সেই তালিকায় অন্যতম। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এর একটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে; ২০২৪ সালে মোট ৬,৯২৭টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে ৭,২৯৪ জন নিহত এবং ১২,০১৯ জন আহত হয়েছেন। আরেকটি স্বাধীন সংস্থা ‘বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি’ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ৬,৩৫৯টি দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৮,৫৪৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১২,৬০৮ জন আহত হয়েছেন। এই তথ্য বাংলাদেশে সড়ক নিরাপত্তার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করে। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি এবং আহত হওয়ার মূল কারণগুলো হলো; একইসাথে চলার নিয়ম ভঙ্গা, অতিরিক্ত গতি, যানবাহনের অপরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ, অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণ ও জনসমাগমের জায়গায় উপযুক্ত ফুটওভারব্রিজ বা পারাপারের ব্যবস্থা না থাকা। বিশেষ করে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা একটি বড়ো অংশ দখল করে আছে। মোট প্রান্তিকে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৮৪৮২ জনের বেশি প্রাণহানি হয়েছে, যেহেতু এটি দেশজুড়ে সবচেয়ে প্রচলিত সড়ক যান। পরিবহন দুর্ঘটনার শিকারদের মধ্যে পথচারী, সাইক্লিস্ট ও দু’চাকার যান চালকগণ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এর ৫ বছরের পরিসংখ্যানের একটি বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৩২,৭৩৩টি দুর্ঘটনায় প্রায় ৩৫,৩৮৪ জন নিহত এবং ৫৩,১৯৬ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে পথচারী ও মোটরসাইকেল চালকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

এসব সংখ্যার পেছনে শুধু রাস্তায় গাড়ি চলাচলের নিয়ম না মানা নয় বরং সঠিক ট্রাফিক আইন কার্যকর করার ব্যর্থতা, শিক্ষার অভাব, ট্রাফিক পুলিশের জনবল ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা এবং জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠানের কম প্রস্তুতিও বড়ো ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, দুর্ঘটনার পর আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, যার ফলে আহতরা জীবনব্যাপী শারীরিক ও মানসিক কষ্টে ভোগেন। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সময়ে নেওয়া উদ্যোগ যেমন “জিরো ফেলটি পরিকল্পনা, আইন কঠোরকরণ এবং নিরাপদ রোড নির্মাণ, কিছু ক্ষেত্রে নিহতের হার কমাতে সহায়তা করছে। তাছাড়া, হেলমেট পরিধান, সিটবেল্ট ব্যবহার এবং গতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত পরিকল্পিত নয়, ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা এখনো উদ্বেগজনকভাবে উচ্চ। সম্প্রতি ২০২৫ সালের তথ্য দেখাচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাস্তা এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে প্রায় ৬,৭২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৯,১১১ জন নিহত এবং ১৪,৮১২ জন আহত হয়েছেন। এই চিত্র বাংলাদেশের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলো চিহ্নিত করলে দেখা যায়; বেপরোয়া ও অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালনা, অদক্ষ চালক ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পথচারীর অসচেতনতা, পথচারী ও মোটরসাইকেল আরোহীর ঝুঁকি এবং আইন প্রয়োগে দুর্বলতা প্রভৃতি। অনেক চালক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই সড়কে নামেন। লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গতি নিয়ন্ত্রণ না মানা, ওভারটেকিংয়ের ঝুঁকি নেওয়া, মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো এসবই দুর্ঘটনার বড়ো কারণ। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) যানবাহনের ফিটনেস সনদ প্রদান ও লাইসেন্স ইস্যুর দায়িত্বে থাকলেও বাস্তবে অনেক অযোগ্য চালক লাইসেন্স পান। বহু পুরোনো ও ত্রুটিপূর্ণ বাস ট্রাক এখনো সড়কে চলাচল করছে। গ্রামীণ সড়কগুলোর অনেকগুলো সরু, বাকযুক্ত এবং যথাযথ সাইনেজবিহীন। মহাসড়কে পর্যাপ্ত ফুটওভার ব্রিজ, জেরা ক্রসিং ও স্পিডব্রেকার নেই। শহরাঞ্চলে পথচারীদের জন্য নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা সীমিত। অনেক পথচারী নির্দিষ্ট জেরা ক্রসিং বা ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে রাস্তা পার হন। গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ রাস্তা পারাপার বা গবাদিপশুর চলাচলও দুর্ঘটনার কারণ হয়। বর্তমানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে হেলমেট না পরা এবং ট্রাফিক আইন অমান্যের কারণে। আইন থাকলেও প্রয়োগে

শৈথিল্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করে। সড়ক দুর্ঘটনা কেবল একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা পঞ্জুত পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। চিকিৎসা ব্যয়, আয়ের ক্ষতি এবং দীর্ঘমেয়াদি মানসিক আঘাত সমাজে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাংকের একাধিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সড়ক দুর্ঘটনা একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষয় করে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মৃত্যু ও অক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা কমে। প্রায় তিনদশক আগে শুটিংয়ে থাকা স্বামী নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের কাছে যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের অদূরে চন্দনাইশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন জাহানারা কাঞ্চন। সেই থেকে নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন শুরু করেন চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। ‘পথ যেন হয় শান্তির, মৃত্যুর নয়’ এই স্লোগান নিয়ে গড়ে তুলেন সামাজিক সংগঠন ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ (নিসচা)। নিসচার পক্ষ থেকে প্রতিবছর ২২ অক্টোবরকে নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে পালনের দাবি জানানো হয়। ২০১৭ সালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই থেকে প্রতিবছর দিবসটি উপলক্ষ্যে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি নিসচাসহ বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। ঢাকা শহরে ২০১৮ সালে দুই শিক্ষার্থীর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর শিক্ষার্থীরা দেশব্যাপী নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনে নামে। ছাত্র জনতার এই আন্দোলন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমর্থন পায় এবং সড়ক নিরাপত্তা ইস্যুটি জাতীয় আলোচনায় কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনও সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করে।

এই আন্দোলনের ফলে সরকার নতুন আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয় এবং সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন করে। ফলে সেবছরই সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রণীত হয়, যেখানে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে মৃত্যুর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আইনের মাধ্যমে জরিমানা ও কারাদণ্ড বৃদ্ধি, লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া কঠোরকরণ, যানবাহনের ফিটনেস যাচাই জোরদার, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়। আইনটি সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আইনটিতে জরিমানা ও কারাদণ্ড বৃদ্ধি করা হয় এবং লাইসেন্স ও ফিটনেস ব্যবস্থাকে কঠোর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়াও জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। সরকার ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্রাটজিক অ্যাকশন ২০২২-২০২৫ প্রণয়ন করেছে, যার লক্ষ্য দুর্ঘটনা ও হতাহতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা। এই কৌশলপত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; নিরাপদ অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ যানবাহন নিশ্চিতকরণ, চালকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্যভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকার বৃহৎ আকারের ‘বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রজেক্ট’ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো; উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মহাসড়ক নিরাপদ করা, আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, দুর্ঘটনা পরবর্তী জরুরি সেবা উন্নয়ন ও চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের পর থেকে সরকার আইনগত সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সড়ক ব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রযুক্তির ব্যবহার ও আধুনিক উদ্যোগ লক্ষণীয়। ডিজিটাল লাইসেন্স, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, সিসিটিভি নজরদারি ও ই-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা চলছে। স্মার্ট ট্রাফিক সিগন্যাল, স্পিড ক্যামেরা এবং ড্যাশবোর্ড ক্যামেরার ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মগুলোর আগমনে সড়ক ব্যবস্থাপনায় নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদিও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যেমন আইন প্রয়োগে দুর্বলতা, দুর্নীতি ও অনিয়ম, জনসচেতনতার অভাব, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য ডাটার অভাব ইত্যাদি। গণমাধ্যম সড়ক দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ করে জনসচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্কুল কলেজে ট্রাফিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই আইন মানার অভ্যাস গড়ে উঠবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর হতে পারে। নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ করণীয় বা ভবিষ্যৎ পথরেখা হতে পারে; কঠোর আইন প্রয়োগ করা। আইন থাকলেই হবে না, তা নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। চালকদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়ন; আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও নিয়মিত দক্ষতা যাচাই প্রয়োজন। নিরাপদ অবকাঠামো উন্নয়ন তথা ফুটওভার ব্রিজ, জেব্রা ক্রসিং, আলোকসজ্জা ও সাইনেজ বৃদ্ধি। ডাটা ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য দুর্ঘটনা ডাটাবেজ তৈরি করে বিশ্লেষণ করা। নাগরিক অংশগ্রহণ; সচেতন নাগরিক আন্দোলন ও সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে ট্রাফিক শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় বৃদ্ধি, জরুরি

সেবা উন্নয়ন ও সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করাও জরুরি। প্রয়োজন শ্রমিক শিক্ষা বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগ শিথিল না করে কঠোরভাবে প্রয়োগ, নিরাপদ সড়ক নকশা, আধুনিক জরুরি সেবা ব্যবস্থা এবং জনগণের মধ্যে আরো সচেতনতা সৃষ্টি। এসব ছাড়া আমাদের সড়ক নিরাপদ হবে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকারকে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশস্ত ও মানসম্মত রাস্তা নির্মাণ, পর্যাপ্ত সাইনবোর্ড, সিগন্যাল ও আলোকসজ্জা স্থাপন জরুরি। দুর্ঘটনাপ্রবণ

এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। কঠোরভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ, ডাইভিং লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করা এবং চালকদের প্রশিক্ষণ জোরদার করা প্রয়োজন। গণসচেতনতা বৃদ্ধি, স্কুল পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা চালু এবং গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা ও জরুরি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত প্রাণহানি কমিয়ে এসডিজি অর্জনে অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে পথচারীদের সর্বদা ফুটপাথ ব্যবহার করা উচিত এবং নির্দিষ্ট জেরা ক্রসিং বা ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হওয়া নিরাপদ। রাস্তা পার হওয়ার আগে ডানে বামে ভালোভাবে দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে কোনো যানবাহন আসছে না। বাঁক বা মোড়ের কাছে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। ট্রাফিক সিগন্যাল ও পুলিশের নির্দেশ মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। মোবাইল ফোন ব্যবহার, হেডফোন কানে দিয়ে হাঁটা বা অসাবধানভাবে গল্প করতে করতে রাস্তা পার হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এসব এড়ানো উচিত। চলন্ত বাস বা গাড়ির সামনে বা পেছন দিয়ে হটাৎ পার হওয়া বিপজ্জনক। রাতের সময় উজ্জ্বল বা প্রতিফলকযুক্ত পোশাক পরলে চালকদের চোখে সহজে পড়া যায়। দৌড়ে রাস্তা পার না হয়ে ধীরে ও সচেতনভাবে চলাচল করা এবং শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করা সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে রাস্তা নির্মাণের সময় বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা মান কঠোরভাবে অনুসরণ করা জরুরি। আঁকাবাঁকা সড়ক পরিহার করে যতটা সম্ভব সরল ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, আর যেখানে বাঁক অপরিহার্য সেখানে যথাযথ বাঁকব্যাস, সতর্কতামূলক চিহ্ন ও গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাস্তার দুই পাশে পর্যাপ্ত সাইনবোর্ড, রিফ্লেক্টর, গার্ডরেল ও স্ট্রিটলাইট স্থাপন করা প্রয়োজন। পথচারীদের জন্য ফুটপাথ, জেরা ক্রসিং ও ফুটওভার ব্রিজ রাখতে হবে। ডেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি করে জলাবদ্ধতা রোধ করতে হবে এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গর্ত ও ভাঙন দ্রুত মেরামত করতে হবে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় স্পিডব্রেকার ও সতর্কবার্তা স্থাপনও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালকদের দুর্ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করা জরুরি। ক্লান্ত, অসুস্থ বা মানসিকভাবে অস্থির অবস্থায় গাড়ি চালানো উচিত নয়। নিয়মিত ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা মনোযোগ ও সতর্কতা বাড়ায়। মদ্যপান বা মাদক সেবনের পর কখনোই স্টিয়ারিং ধরা যাবে না। গাড়ি চালানোর আগে ব্রেক, লাইট, টায়ার ও ইঞ্জিন পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ট্রাফিক আইন মেনে চলা, নির্ধারিত গতিসীমা বজায় রাখা এবং নিরাপদ দূরত্ব রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক। দীর্ঘ পথে নির্দিষ্ট সময় পরপর বিরতি নিলে ক্লান্তি কমে ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সেবা দিতে সরকারকে আধুনিক ট্রমা সেন্টার স্থাপন ও জেলা উপজেলা পর্যায়ে জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। মহাসড়কের পাশে সুসজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ২৪ ঘণ্টা জরুরি হটলাইন ও প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক টিম নিশ্চিত করা জরুরি। হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ, রক্তব্যাংক ও অস্ত্রোপচারের উন্নত সুবিধা বাড়াতে হবে। চিকিৎসকদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং দ্রুত রেফারেল ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনাস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে প্রশিক্ষিত করা উচিত। পাশাপাশি দরিদ্র রোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহার ও অক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আইন, অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং সচেতনতা এই চারটি স্তরের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয়। সড়ক নিরাপত্তা একটি মানবাধিকার ইস্যু। প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদে চলাচলের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই কেবল “নিরাপদ সড়ক” একটি স্লোগান থেকে বাস্তবতায় রূপ নিতে পারে।

পরিশেষে, যদি বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল আরো দীর্ঘ হবে।

#

লেখক: প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও কথাসাহিত্যিক।

পিআইডি ফিচার